الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব: দাওয়াত ও জীবনচরিত

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব: দাওয়াত ও জীবনচরিত

লেখক: শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু আব্দুল্লাহ ইবন বায

সকল প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাঁর বান্দা, রাসূল, তাঁর সৃষ্টিকূলের সর্বোৎকৃষ্ট মানব আমাদের নেতা ও ইমাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবীগণ ও যারা তাদেরকে ভালোবাসেন তাদের উপরও রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন।

অতঃপর, হে সম্মানিত ভাইয়েরা, হে প্রিয় সন্তানগণ, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি—

চিন্তাধারাকে আলোকিত করার জন্য, সত্যকে স্পষ্ট করার জন্য,

আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের প্রতি উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে

এবং যার সম্পর্কে এই আলোচনা হচ্ছে, তাঁর প্রতি আমার উপর যে হক ও দায়িত্ব রয়েছে তার কিছু অংশ আদায় করার উদ্দেশ্যে। এই আলোচনার শিরোনাম হলো: শাইখ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব এবং তাঁর দাওয়াহ ও জীবনচরিত।

যেহেতু ধর্মীয় সংস্কারক, দাঈ (আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী) ও মুজাদ্দিদদের (ধর্মের পুনর্জীবনকারী) কথা আলোচনা করা,

তাদের অবস্থা ও প্রশংসনীয় গুণাবলি স্মরণ করা, তাদের গৌরবময় কাজ ও জীবনচরিত বর্ণনা করা— যা তাদের ইখলাস, দাওয়াতের সত্যতা ও সংস্কারে আন্তরিকতা প্রমাণ করে—

যেহেতু এই মহান সংস্কারকদের সম্পর্কে আলোচনা — তাদের চরিত্র, কর্ম এবং জীবনী — এমন একটি বিষয়, যা হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, মনকে প্রশান্ত করে এবং প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, সংস্কার প্রত্যাশী ও সত্যপথের আহ্বানকারী তা শুনতে ভালোবাসে, এই বিষয়গুলো বিবেচনা করে আমি ঠিক করেছি যে, আমি আপনাদের সামনে এক মহান ব্যক্তি, বিশিষ্ট সংস্কারক এবং একনিষ্ঠ দাঈর কথা তুলে ধরব — তিনি হলেন সেই সম্মানিত শাইখ, যিনি দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপে ইসলামের নবজাগরণ ঘটিয়েছেন। তিনি হলেন: ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহ্হাব ইবন সুলায়মান ইবন আলী আত-তামিমী আল-হানবালী।

এই মহামানব ইমামের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়েছিল— বিশেষ করে আলেম, শাসক, সমাজপতি এবং আরব উপদ্বীপ ও এর বাইরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাঝে। তাঁকে নিয়ে মানুষ অনেক লিখেছে— কখনো সংক্ষেপে, আবার কখনো বিস্তারিতভাবে। অনেকেই শুধু তাঁকে কেন্দ্র করে বই-পুস্তক লিখেছেন। এমনকি পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদরাও তাঁকে নিয়ে অনেক লিখেছেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে উল্লেখ করেছেন ইসলামী সংস্কারক ও ইতিহাস সম্পর্কিত লেখালেখির মাঝে। যাঁরা

ন্যায়পরায়ণভাবে তাঁকে বিশ্লেষণ করেছেন, তারা একমত হয়েছেন যে— তিনি ছিলেন একজন মহান সংস্কারক, ইসলামের একজন নবজাগরণকারী (মুজাদ্দিদ) এবং তিনি তাঁর রবের পক্ষ থেকে নুর ও হিদায়েতের উপর ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে যারা লিখেছেন, তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, তা গণনা করা কঠিন।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিখ্যাত লেখক আবু বকর শাইখ হুসাইন ইবন গান্নাম আল-ইহসায়ী। তিনি এই শাইখ সম্পর্কে অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী লেখনী উপহার দিয়েছেন। তিনি তার জীবনী ও তার সংগ্রাম সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর চিঠিপত্র সম্পর্কে এবং মহান আল্লাহর কিতাব থেকে তাঁর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে আরেকজন হলেন শাইখ উসমান ইবন বিশর —তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "উনওয়ানুল মজদ"-এ (عنوان المجد) এই শাইখ, তাঁর দাওয়াত, তাঁর জীবনী, জীবন ইতিহাস, জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। আর আরব উপদ্বীপের বাইরের লেখকদের মধ্যে রয়েছেন ড. আহমদ আমীন, যিনি তাঁর গ্রন্থ "যুআমা-উল-ইসলাহ"-এ (زعماء الإصلاح) এই শাইখ সম্পর্কে লিখেছেন এবং ইনসাফ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে লেখকদের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল কাবীর মাসঊদ আন-নদভী। তিনি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন এবং তাঁকে বলেছেন: "মজলুম সংস্কারক" (المصلح

(المظلوم)। তিনি ইমামের জীবনী সম্পর্কে লিখেছেন এবং তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আরও অনেকে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শাইখুল কাবীর আমীর মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আস-সানআনী। তিনি ছিলেন ইমামের সমসাময়িক এবং ইমামের দাওয়াতের সমর্থক। যখন তাঁর কাছে ইমামের দাওয়াত পৌঁছে, তখন তিনি এতে অত্যন্ত খুশি হন এবং এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করেন।

অনুরূপভাবে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন বিখ্যাত আলেম শাইখ মুহাম্মদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী, যিনি "নাইলুল আওতার" গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ইমামের প্রশংসায় একটি বিশাল শোকগাথা রচনা করেন। তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক আলেম ও গবেষক লিখেছেন, যাঁদেরকে পাঠক ও বিদ্বানগণ ভালো করেই জানেন। যেহেতু অনেক মানুষ এই ইমামের জীবন, তাঁর দাওয়াত ও কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই আমি মনে করেছি, এই মহান ব্যক্তির অবস্থা,

তাঁর উত্তম জীবনচরিত, বিশুদ্ধ দাওয়াত এবং সত্যনিষ্ঠ জিহাদের কিছু বিবরণ তুলে ধরি। আমি এই ইমাম সম্পর্কে যে অল্প কিছু জানি, তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করব, যাতে করে যাদের মনে এই মহামানব, তাঁর দাওয়াত ও কর্মধারা সম্পর্কে কোনো বিভ্রান্তি বা সন্দেহ রয়েছে, তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারেন এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করতে পারেন। এই ইমাম জন্মগ্রহণ

করেন হিজরী ১১১৫ সনে। এটাই তাঁর জন্মসন হিসেবে অধিক প্রসিদ্ধ (আল্লাহ তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন)। তবে কারও কারও মতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১১১ হিজরীতে। তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো: তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১১১৫ হিজরী সনে। হিজরতকারী নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বোত্তম দরূদ ও পূর্ণাঙ্গ সালাম।

তিনি তাঁর পিতার কাছেই শিক্ষা গ্রহণ করেন আল-'উআইনাহ নামক স্থানে। এই জনপদটিই ছিল তাঁর জন্মস্থান— আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন। আল-'উআইনাহ হলো ইয়ামামা অঞ্চলের একটি পরিচিত গ্রাম, যা নাজদ প্রদেশে অবস্থিত, রিয়াদ শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং রিয়াদ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার। সেখানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সৎ ও নেক পরিবেশে বড় হন, ছোটবেলাতেই কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন এবং পড়াশোনা ও দ্বীনি জ্ঞানে গভীর মনোযোগ দেন। তিনি তাঁর পিতা শাইখ আব্দুল ওহ্হাব ইবন সুলায়মান-এর অধীনে অধ্যয়ন করেন, যিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট ফকীহ, সম্মানিত আলেম এবং আল-'উআইনাহ নগরের একজন বিচারপতি। বালেগ হওয়ার পর তিনি হজ পালন করেন এবং বাইতুল্লাহ শরীফে উপস্থিত হন। সেখানে হারাম শরীফের কিছু আলেমের কাছ থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। এরপর তিনি রওনা হন মদিনার উদ্দেশ্যে—যেখানে চিরনিবাস স্থাপন করেছেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি মদিনার বিশিষ্ট আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সেখানে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং সে যুগে মদিনার দুইজন বিখ্যাত ও বড় মাপের আলেমের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। এই দুইজন মহান আলেম হলেন: শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু ইব্রাহীম ইবন সাইফ আন-নাজদী, যিনি মাজমা‘আহ শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি হলেন বিখ্যাত ফারায়েজ শাস্ত্রবিশারদ শাইখ ইব্রাহীম ইবন আব্দুল্লাহ-এর পিতা, যিনি "আল-আযবুল ফায়েয ফি ‘ইলমিল ফারায়েয" العذب الفائض في علم الفرائض গ্রন্থের রচয়িতা।

এছাড়াও, তিনি মদীনায় শিক্ষা গ্রহণ করেন শাইখুল কাবীর মুহাম্মদ হায়াৎ আস-সিন্ধী-এর নিকট। এই দুইজন আলেম থেকে শাইখ মদিনায় শিক্ষা লাভ করেন বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছেন। তবে সম্ভবত তিনি মদিনায় আরও অন্যান্য আলেমের কাছ থেকেও ইলম গ্রহণ করেছেন, যাদের নাম আমাদের অজানা।

শাইখ ইলম অন্বেষের উদ্দেশ্যে ইরাক সফর করেন। তিনি বসরা নগরী গমন করেন এবং সেখানকার আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ তাঁর জন্য যা ইলম অর্জন করা ইচ্ছা করেছেন তিনি তাদের থেকে তা অর্জন করেন। তিনি সেখানে আল্লাহর তাওহীদের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান এবং সবাইকে সুন্নতের দিকে ডাকেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেন যে, সকল মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো—তাদের দ্বীন যেন আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন, আলেমদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং বিতর্কও করেন। সেখানকার একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন শেখ মুহাম্মদ আল-মাজমূঈ—তিনি শাইখের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু বসরার কিছু খারাপ আলেম তার ও তার উস্তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তাদের কিছু নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এই পরিস্থিতির কারণে তিনি বসরা ছেড়ে চলে যান। তার উদ্দেশ্য ছিল সিরিয়া যাওয়ার, কিন্তু পর্যাপ্ত খরচ না থাকায় তিনি তা পারেননি। ফলে তিনি বসরা থেকে যাত্রা করে যুবাইর শহরে যান এবং সেখান থেকে আল-আহসা (বর্তমান সৌদি আরবের একটি অঞ্চল) যান। সেখানে তিনি সেখানকার আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং আকীদাহ তথা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর তিনি হুরাইমিলা শহরে গমন করেন—এটি হবে হিজরী ১২শ শতকের পঞ্চম দশকে (আল্লাহই ভালো জানেন)। কারণ, তার পিতা আল-উয়ায়ইনাহ (العيينة) শহরে কাজী (বিচারক) ছিলেন এবং সেই শহরের শাসকের সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়। ফলে তিনি আল-উয়ায়ইনাহ ছেড়ে দিয়ে হিজরী ১১৩৯ সনে হুরাইমিলায় চলে যান। এরপর শাইখ মুহাম্মাদ তার পিতার পেছনে হুরাইমিলায় আগমন করেন, সম্ভবত হিজরী ১১৪০ সালে বা তার পরবর্তী কোনো সময়ে। তিনি সেখানে বসবাস শুরু করেন এবং হুরাইমিলায় অবস্থানকালে তিনি

গভীরভাবে ইলম অর্জন, শিক্ষা প্রদান এবং দাওয়াহর কাজে ব্যস্ত থাকেন। এভাবে তিনি তার পিতার মৃত্যু পর্যন্ত হুরাইমিলায় ছিলেন; তার পিতা হিজরী ১১৫৩ সালে ওফাত পান। তবে এরপর হুরাইমিলার কিছু লোকের পক্ষ থেকে তার প্রতি অনিষ্ট প্রকাশ পায়। কিছু নিচু শ্রেণির লোক তার ওপর আক্রমণের পরিকল্পনা করে। বলা হয়, তাদের কেউ কেউ দেয়াল টপকে তার ঘরে প্রবেশের চেষ্টাও করে। কিন্তু কিছু লোক সে ঘটনা জেনে ফেলে, ফলে তারা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর শাইখ হুরাইমিলা ত্যাগ করে আল-উয়ায়ইনাহ শহরে চলে যান।

এই নিচু শ্রেণির লোকদের তার প্রতি রাগ ও ক্ষোভের কারণ ছিল—তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতেন। তিনি শাসকদের উৎসাহ দিতেন যেন অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হয়—সেসব অপরাধী যারা মানুষকে লুটপাট করত, আক্রমণ করত ও কষ্ট দিত। এই নিচু শ্রেণির লোকদের তখন সেখানে "আল-আবীদ" বলা হতো। যখন তারা বুঝতে পারল যে, শাইখ তাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাদের কার্যকলাপকে তিনি সমর্থন করেন না এবং তিনি শাসকদের তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উৎসাহিত করছেন, তখন তারা তার ওপর ক্ষুব্ধ হয় এবং তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন ও রক্ষা করেন। এরপর তিনি আল-উয়ায়নাহ শহরে চলে যান। তখন সে শহরের আমির ছিলেন উসমান ইবন নাসের ইবন মা‘মার। তিনি

শাইখকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে বললেন: আপনি আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি এবং আপনাকে সাহায্য করব। আমির তার প্রতি সদ্ভাব, ভালোবাসা ও সমর্থন প্রকাশ করেন এবং তার দাওয়াহকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন।

তখন শাইখ শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করতেন এবং তাদের নারী-পুরুষ সবার মাঝে আল্লাহর ভালোবাসার সম্প্রীতি ছড়িয়ে দিতেন। তার খ্যাতি আল-উয়ায়নাহ শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং তার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ তার কাছে আসতে লাগল। একদিন শাইখ আমির উসমানকে বললেন: আসুন, আমরা জায়েদ ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কুব্বা (গম্বুজওয়ালা কবর) ধ্বংস করে দিই। কেননা এটি সঠিক পথে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই কাজকে পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের উপর নির্মাণ ও তা মসজিদে পরিণত করার বিষয় নিষেধ করেছেন। এই কুব্বাটি মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, তাদের আক্বীদা (বিশ্বাস) পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং এর মাধ্যমে শিরকের কাজ হয়েছে। তাই এটি ধ্বংস করা জরুরি।

আমির বললেন: এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তখন শাইখ বললেন: আমি আশঙ্কা করছি যে,

জুবাইলাহ্ গ্রামের লোকেরা বিদ্রোহ করে বসতে পারে। জুবাইলাহ্ ছিল একটি গ্রাম, যা সেই কবরের কাছাকাছি অবস্থিত। এরপর আমীর উসমান ৬০০ যোদ্ধাসহ সেই গম্বুজ (কবরের উপর নির্মিত গম্বুজ) ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ নিজেও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। যখন তাঁরা গম্বুজের নিকট পৌঁছালেন, তখন জুবাইলাহ্‌র লোকেরা এ সংবাদ শুনে গম্বুজকে রক্ষা করার জন্য বেরিয়ে এল। কিন্তু তারা যখন আমীর উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের দেখল, তখন তারা সরে গেল এবং কোনোরূপ বিরোধিতা না করেই ফিরে গেল। এরপর শাইখ নিজ হাতে গম্বুজটি ধ্বংস করতে শুরু করলেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতেই সেটি সরিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। এখন আমরা আলোচনা করবো — শাইখ (রেহিমাহুল্লাহ) এর আগমন ও দাওয়াতের পূর্বে নাজদ অঞ্চলের অবস্থা কেমন ছিল এবং কী ছিল তাঁর দাওয়াহ শুরু করার কারণ ও উদ্দেশ্য।

শাইখ এর দাওয়াত শুরু হওয়ার আগে নাজদ অঞ্চলের মানুষের অবস্থা এমন ছিল, যা কোনো ঈমানদার মানুষ মেনে নিতে পারে না। বড় শিরক জন্ম নিয়েছিল এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এমনকি কবরের ওপর তৈরি করা গম্বুজগুলোকেও উপাসনা করা হতো, গাছপালা, পাথর, গুহা—এসবও উপাস্যরূপে পূজিত হতো। এমনকি এমন কিছু লোককেও উপাসনা করা হতো, যারা নিজেদেরকে অলী

(আল্লাহর বন্ধু) বলে দাবি করত, অথচ তারা ছিলেন বিকারগ্রস্ত ও পাগল প্রকৃতির মানুষ। অনেক পাগল ও বুদ্ধিহীন ব্যক্তিকেও "ওলী" মনে করে তাদের ডাকা হতো, তাদের কাছে প্রার্থনা করা হতো। নজদ অঞ্চলে জাদুকর ও গায়েবি কথা বলা গণকরা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। মানুষ তাদের কাছে যেত, তাদের কথা বিশ্বাস করত এবং তাদের কোনো বিরুদ্ধাচরণকারী খুব কমই ছিল, আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা রক্ষা করেছেন তিনি ছাড়া। মানুষদের মাঝে দুনিয়ার মোহ ও ভোগবিলাসের প্রতি ঝোঁক ছিল প্রবল, আর আল্লাহর জন্য কাজ করা এবং তাঁর দ্বীনের সাহায্যে এগিয়ে আসা মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ অবস্থা কেবল নাজদেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং হারামাইন শরীফাইন এবং ইয়েমেনেও একই অবস্থা বিরাজ করছিল। সেখানেও শিরক ছিল ব্যাপক, কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ, অলীদের ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া—এসব প্রচলিত ছিল। ইয়েমেনে এমন বহু উদাহরণ পাওয়া যায়।

নাজদের বিভিন্ন শহরে কবর, গুহা, গাছ, এমনকি কোনো পাগল বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহর পরিবর্তে ডাকা হতো, তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হতো। এছাড়াও নাজদ একটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত বিষয় ছিল—জিনদের ডাকা, তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া এবং তাদের জন্য পশু কোরবানি দেওয়া। অনেক সময় এসব কোরবানির মাংস ঘরের কোণায় রেখে দেওয়া হতো, যেন তারা সাহায্য করে বা যেন

তাদের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যখন শাইখ ইমাম মানুষের মাঝে এ শিরক এবং তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া দেখলেন, আর দেখলেন যে এর প্রতিবাদকারী কেউ নেই, কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিচ্ছে না—তখন তিনি দৃঢ় সংকল্পে কাজ শুরু করলেন। তিনি ধৈর্যসহকারে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গেলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, এ পথে জিহাদ করতে হবে, কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতা সহ্য করতে হবে। তিনি আল-উয়ায়নাহ এলাকায় থাকাকালীন শিক্ষা, দিকনির্দেশনা ও উপদেশ দেওয়ার কাজে আন্তরিকভাবে মনোনিবেশ করলেন। তিনি আলেমদের চিঠি লিখে এই বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন—এই আশায় যে তারা তাঁর সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার কাজে এগিয়ে আসবেন এবং শিরক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ নেবেন।

নজদের অনেক আলেম, হারামাইন শরীফাইনের আলেম, ইয়েমেনের আলেম এবং অন্যান্য স্থানের আলেমরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করেন ও তাঁর প্রতি সমর্থন জানান এবং তাঁকে চিঠি লিখে সমর্থনও প্রদান করেন। অবশ্য কিছু লোক তাঁর দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল, তাঁর প্রতি আপত্তি জানিয়েছিল এবং তাঁর কাছ থেকে মানুষকে বিমুখ করার চেষ্টা করেছিল। এই বিরোধীদের অবস্থা ছিল দুই ধরনের—কেউ ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যে আল্লাহর দ্বীন বা তাওহীদ সম্পর্কে কিছুই জানত না; সে কেবল তার পিতা-পিতামহদের

অজ্ঞতা, গোমরাহী, শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের পথকেই সত্য জ্ঞান করত। এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন:

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

"[বরং তারা বলে:] 'নিশ্চয় আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি আর নিশ্চয় আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে হেদায়াতপ্রাপ্ত হব।" [আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৩] আরেকটি দল, যারা নিজেদেরকে আলেম বলে মনে করত, তারা জিদ ও হিংসার কারণে শাইখের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল—এই আশঙ্কায় যে, সাধারণ মানুষ না যেন বলে বসে: "তাহলে তোমরা এতদিন আমাদের এই কাজগুলোর প্রতিবাদ করোনি কেন? ইবন আব্দুল ওহ্হাব কেন এলেন এবং সত্যের ওপর স্থির থাকলেন, অথচ তোমরা তো আলেম — তবুও এসব মিথ্যা ও বাতিলের প্রতিবাদ করোনি কেন?! অতঃপর তারা তাকে হিংসা করল এবং সাধারণ মানুষের কাছে লজ্জিত বোধ করল। তারা জেনে-বুঝে সত্যের বিরোধিতা করল—দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভকে আখিরাতের চিরস্থায়ী সফলতার উপর অগ্রাধিকার দিল। এভাবে তারা ইহুদিদের অনুসরণ করল, যারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতকে ত্যাগ করেছিল। আমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সুস্থতা কামনা করি।

আর শাইখ ধৈর্য ধারণ করলেন এবং দাওয়াতে দৃঢ়ভাবে অটল রইলেন। জাজিরাতুল আরবের ভিতরে ও বাইরে যেসব আলিম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, তারা তাকে উৎসাহ দিতে থাকলেন। এতে করে তিনি আরও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ চালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। ইতোপূর্বে তিনি আল্লাহর কিতাবে নিজেকে নিবদ্ধ করেছিলেন এবং কুরআনের তাফসির ও তাঁর থেকে আহকাম নির্ধারণে তিনি অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সীরাত ও সাহাবাগণের জীবনী গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং এতে প্রচণ্ড মনোযোগ ও নিষ্ঠা দেখান—যার মাধ্যমে তিনি এমন এক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, যা তাকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করে ও দৃঢ় করে তোলে। অতঃপর তিনি পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন, এই সংকল্প নিয়ে যে—তিনি আল্লাহর তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে দেবেন, মানুষকে তা জানাবেন এবং এ ব্যাপারে আমীরদের ও আলেমদের কাছে চিঠি লিখবেন, আর যা কিছুই ঘটুক না কেন—তিনি তাঁর দাওয়াতি মিশন থেকে সরে আসবেন না।

অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য কল্যাণময় আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করে দিলেন। তাঁর মাধ্যমে দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিলেন, সত্যকে তাঁর মাধ্যমে শক্তিশালী করলেন এবং তাঁর জন্য সাহায্যকারী,

সহযোগী ও সহকর্মী প্রস্তুত করে দিলেন—যার ফলে আল্লাহর দ্বীন প্রকাশ পেল এবং আল্লাহর বাণী সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো। শাইখ তখন আল-উয়ায়নাহ এলাকায় দাওয়াত চালিয়ে যেতে লাগলেন—শিক্ষাদান ও মানুষকে সৎপথে পরিচালনার মাধ্যমে। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন যে কেবল উপদেশ, বক্তৃতা ও শিক্ষা দিয়ে মানুষকে পরিবর্তন করা যাচ্ছে না—তখন তিনি দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বাস্তবভাবে কাজ শুরু করলেন। তিনি নিজ হাতে শিরকের নিদর্শনগুলো সরানোর জন্য উদ্যোগ নিলেন—যা কিছু সম্ভব ছিল, তা অপসারণ করতে চেষ্টা করলেন। শাইখ আমীর উসমান ইবনু মা‘মারকে বললেন: এই গম্বুজটি, যা যায়েদ-এর কবরের উপর নির্মিত—এটি অবশ্যই ভেঙে ফেলতে হবে। উল্লেখ্য, যাইদ ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হলেন খলিফা ও মু’মিনদের আমীর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই। তিনি ছিলেন সেই শহীদদের একজন, যাঁরা হিজরতের ১২তম বছরে মুসায়লিমা নামক মিথ্যাবাদীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তিনি সেখানেই নিহত হন। লোকেরা বলে যে, তার কবরের উপরে গম্বুজ স্থাপন করা হয়। যদিও এটি নিশ্চিত নয়—হতে পারে এটি অন্য কারো কবর—তবুও সাধারণ ধারণা ছিল, এটি যায়েদ-এর কবর। পূর্বোক্ত ঘটনার মতো আমীর উসমান এতে সম্মতি দেন এবং আল্লাহর প্রশংসা যে, সেই গম্বুজটি ধ্বংস করে ফেলা হয়। আজ পর্যন্ত সেটির কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট

নেই—এটি আল্লাহরই অনুগ্রহ ও দয়া। আল্লাহ তা'আলা ওই গম্বুজটিকে মুছে দিয়েছেন—কারণ তা ভেঙে ফেলা হয়েছিল বিশুদ্ধ নিয়ত, সঠিক উদ্দেশ্য এবং সত্যের পক্ষে সাহায্যের ভিত্তিতে। এছাড়াও সেখানে আরও কিছু কবর ছিল—তার মধ্যে একটি সম্পর্কে বলা হতো, এটি হচ্ছে সাহাবী দিরার ইবনুল আজওয়ার-এর কবর। সেটির ওপরও একটি গম্বুজ ছিল, যা ধ্বংস করে ফেলা হয়। আরও কিছু মাজার-গম্বুজ ও শিরকী নিদর্শন ছিল, যেগুলো আল্লাহ তা'আলাই সরিয়ে দিয়েছেন। সেখানে কিছু গুহা ও গাছ ছিল, যেগুলোকে আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে উপাসনা করা হতো। পরে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়, সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয় এবং মানুষকে সেসব থেকে সতর্ক করা হয়।

মূল কথা হলো, শাইখ পূর্বে যেমনটি বলা হয়েছে, তেমনি তিনি দাওয়াতের কাজে কথায় ও কাজে অবিচল ছিলেন। এরপর একদিন এক নারী তাঁর কাছে এসে একাধিকবার ব্যভিচারের কথা স্বীকার করল। শাইখ তার মানসিক অবস্থার ব্যাপারে জানতে চাইলেন, তখন বলা হলো—সে সুস্থ, তার মানসিকতায় কোনো সমস্যা নেই। যখন সে (নারী) নিজের অপরাধে অটল রইল, স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসল না, কোনো জবরদস্তি বা ভুল বোঝাবুঝির অজুহাতও দেখাল না এবং জানা গেল যে সে বিবাহিত—তখন শাইখ রাহিমাহুল্লাহ, যিনি তখন আল-উয়ায়নাহ এলাকায় কাজি ছিলেন, রজম (পাথর নিক্ষেপ করে শাস্তি) প্রদানের আদেশ দেন।

অতঃপর তাঁর আদেশে সেই নারীর উপর রজমের শাস্তি কার্যকর করা হয়। এরপর শাইখের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ে—গম্বুজ ভাঙার ঘটনা, ব্যভিচারিণী নারীকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেওয়ার ঘটনা, আল্লাহর পথে তাঁর মহান দাওয়াত এবং বিভিন্ন জায়গা হতে আল-উয়ায়নাহ শহরে হিজরতকারীদের হিজরত করার কারণে।

আল-আহসা ও তার আশেপাশের অঞ্চলসমূহের আমীর — বনু খালিদের সুলাইমান ইবন উরাইয়ার আল-খালিদী — এর নিকট শাইখের বিষয়টি পৌঁছাল যে, তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, গম্বুজসমূহ ধ্বংস করে ফেলেন, হুদূদ কায়েম করেন, কাজেই এই মরুবাসী বেদুইন শাইখের কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত কঠিন ভাবে দেখল। যেহেতু বেদুইনদের অভ্যাস হচ্ছে - যাকে আল্লাহ হেদায়েত দান করেছেন তিনি বাদে - জুলুম করা, রক্তপ্রবাহ করা, ধন-সম্পদ লুন্ঠন করা এবং পবিত্রতা লঙঘন করা ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত আমীর আশঙ্কা করলো যে, এই শাইখের বিষয়টি বড় আকার ধারন করবে এবং বেদুইন আমীরের ক্ষমতাকে নস্যাৎ করবে। সুতরাং সে উসমানের কাছে ভীতি প্রদর্শন করে চিঠি লিখল আর তাকে আদেশ দিল: আল-উয়ায়নাহ শহরে তার কাছে থাকা এই অনুসৃত ব্যক্তিকে হত্যা করতে হবে। আর সে এটাও বলল: নিশ্চয়ই এই অনুসৃত ব্যক্তি যে তোমাদের কাছে রয়েছে, আমাদের কাছে তার ব্যাপারে এই... এই... পৌঁছেছে। হয়ত তুমি তাকে হত্যা

করবে অথবা আমরা তোমাকে যে ট্যাক্স প্রদান করি তা প্রদান করা বন্ধ করে দিবো। আমীর উসমানের জন্য সুলাইমানের উপর স্বর্ণের ট্যাক্স ধার্য ছিল। উসমানের কাছে এই আমীরের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠল এবং সে ভয় পেল যে যদি সে তার আজ্ঞা অমান্য করে, তাহলে তাকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিবে বা সে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। তখন তিনি শাইখকে বললেন: এই আমীর আমাদের কাছে এমন-এমন, কথা লিখে পাঠিয়েছে। আপনাকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে শোভন হবে না। আমরা এই আমীরকে ভয় পাই এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্যও আমাদের নেই। তাই আপনি যদি আমাদের অঞ্চল থেকে চলে যাওয়াকে উপযুক্ত মনে করেন, তাহলে অনুগ্রহ করে চলে যান। এরপর শাইখ বললেন: আমি যে আহ্বান জানাই তা হলো আল্লাহর দীন — 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটিকে বাস্তবিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং 'মুহাম্মদু রসূলুল্লাহ'—এর সাক্ষ্যকে কার্যকর করা। যে ব্যক্তি এই দীনে দৃঢ় থাকবে, এটাকে সমর্থন করবে ও সত্যনিষ্ঠভাবে এ পথে থাকবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, তাকে শক্তি দেবেন এবং তার শত্রুদের দেশসমূহের উপর শাসনভার দান করবেন। আপনি যদি ধৈর্য ধরেন, সৎ থাকেন এবং এই কল্যাণ গ্রহণ করেন, তবে শুভ সংবাদ—আল্লাহ আপনাকে জয় দান করবেন, এই বেদুইন ও অন্যান্যের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন এবং আপনাকে তার দেশ ও গোত্রর ওপরে

ক্ষমতা দান করবেন। তিনি বললেন: হে শাইখ, আমরা তার সঙ্গে লড়তে সক্ষম নই এবং তাকে অমান্য করে সহ্য করার ধৈর্যও আমাদের নেই। এরপর শাইখ আল-উয়ায়নাহ (العيينة) থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং 'দিরইয়্যাহর' (الدرعية) অঞ্চলে চলে গেলেন। বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি সেখানে হেঁটেই গিয়েছিলেন—সকালে আল-উয়ায়নাহ থেকে পায়ে হেঁটে রওনা হয়ে সূর্যাস্তের দিকে 'দিরিয়্যাহ' পৌঁছান। আমীর উসমান তাকে কোনো বাহন বা সঙ্গী দিয়ে পাঠাননি। শাইখ যখন 'দিরইয়্যাহর' পৌঁছান, তখন তিনি শহরের উপরের দিকে বসবাসকারী একজন সৎ ব্যক্তি—যার নাম ছিল মোহাম্মদ ইবন সুওয়াইলিম আল-উরাইনি—তার বাড়িতে আশ্রয় নেন। তবে বলা হয়ে থাকে, এই ব্যক্তি শাইখকে নিজের ঘরে থাকতে দেওয়ায় ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল, পৃথিবী যেন সংকুচিত হয়ে এসেছে এবং তিনি দিরইয়্যাহর শাসক মোহাম্মদ ইবন সউদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

তখন শাইখ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন... শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন! আমি মানুষকে যে বিষয়ের দিকে ডাকছি, তা আল্লাহর দ্বীন। আল্লাহ অবশ্যই এই দ্বীনকে প্রকাশ ও বিজয় দান করবেন। এদিকে মুহাম্মাদ ইবন সা'ঊদের কাছে শাইখ মুহাম্মাদের খবর পৌঁছে গেল। বলা হয় যে, তাকে তার স্ত্রীই এ সংবাদ দিয়েছিলেন। তার কাছে কতিপয় সৎকর্মশীল ব্যক্তি আগমণ করে তাকে বলেছিলেন: আপনি আমীর মুহাম্মদ ইবন সা'ঊদকে

এই শায়েখ সম্পর্কে সংবাদ দিন। তাকে এই শাইখের দাওয়াত কবুল করার জন্য উৎসাহ প্রদান করুন। তাকে তার সহযোগিতা ও সাহায্য করার জন্য উৎসাহ দিন। আমীর মুহাম্মাদের স্ত্রী একজন নেককার ও মহীয়সী নারী ছিলেন। তাই যখনই তার কাছে (স্বামী) দিরইয়্যাহর আমীর মুহাম্মাদ ইবন সা'ঊদ আসলেন, তখনই তাকে বললেন: এই মহান গণীমতের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটি একটি গনিমত যা আল্লাহ আপনার কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন। একজন দা'ঈ ব্যক্তি যে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান করেন, আল্লাহর কিতাবের দিকে আহবান করেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহর দিকে আহবান করেন। কতই না মহান সে গনিমত! আপনি অতি দ্রুত তা গ্রহণ করুন, অতি দ্রুত তার সাহায্যে এগিয়ে আসুন এবং কখনোই পিছনে ফিরে তাকাবেন না। ফলে আমির তার পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং এরপর তিনি চিন্তা করতে শুরু করলেন যে, তিনি নিজেই তার কাছে যাবেন নাকি তাকে তার কাছে দাওয়াত দিবেন?! অতঃপর তাকে পরামর্শ দেওয়া হলো, বলা হয়ে থাকে যে, একদল সৎকর্মশীলদের সাথে তার স্ত্রীই তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যারা তাকে বলেছিলেন: এটা সমীচীন নয় যে, আপনি তাকে আহ্বান করবেন, বরং এটা উচিত যে, আপনি তার বসবাসের স্থানে নিজেই যাবেন। আপনি ইলম এবং কল্যাণের পথে আহ্বানকারীকে সম্মান করবেন। তখন তিনি এ কথায় সাড়া দিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তার জন্য

সৌভাগ্য ও কল্যাণ লিখে রেখেছিলেন এবং তার গন্তব্যকে সম্মানিত করেছিলেন। সুতরাং তিনি মুহাম্মাদ ইবন সুওয়াইলিমের বাড়িতে অবস্থানরত শাইখের কাছে যান। তিনি তার কাছে উপস্থিত হন, তাকে সালাম দেন এবং তার সাথে আলোচনা করেন। তিনি বললেন: শাইখ মুহাম্মাদ আপনি সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, নিরাপত্তার সুসংবাদ গ্রহণ করুন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সুসংবাদ গ্রহণ করুন। তখন শাইখ তাকে বললেন: আপনিও সাহায্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন, উত্তম গন্তব্যের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। এটা হচ্ছে আল্লাহর দীন, যে ব্যক্তি একে সাহায্য করবে আল্লাহও তাকে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি একে শক্তিশালী করবে, আল্লাহ তা'আলাও তাকে শক্তিশালী করবেন। আর এর প্রভাব আপনি খুব দ্রুত অচিরেই দেখতে পাবেন। তখন তিনি বললেন: হে শাইখ! অচিরেই আমি আপনার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দীনের উপরে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উপরে বাই'আত গ্রহণ করব। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি, যখন আমরা আপনাকে শক্তিশালী করব এবং আপনাকে সহযোগিতা করব, আর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে ইসলামের শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করাবেন, তখন আপনি আমাদের এই ভূমি ছেড়ে অন্যত্রে চলে যাবেন। আমাদেরকে রেখে আপনি অন্য স্থানে প্রস্থান করবেন। শাইখ বললেন: না; আমি আপনার কাছে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার করছি। আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করছি যে,

রক্তের প্রয়োজনে রক্ত, ধ্বংসের প্রয়োজনে ধ্বংস, আমি আপনার এই শহর থেকে কখনোই অন্যত্রে যাব না। এরপর তিনি তাঁকে সাহায্য করা এবং এই শহরেই স্থায়ীভাবে থাকার ব্যাপারে বাই'আত নিলেন। আর এটা এ মর্মে যে, তিনি আমীরের নিকটেই অবস্থান করবেন, তিনি তাকে সহযোগিতা করবেন এবং তার সাথে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তার দীনকে বিজয়ী করেন। এ কথার উপরে বাই'আত সম্পন্ন হল। অতঃপর আল-উয়ায়নাহ, আরাকাহ, মানফূহাহ, রিয়াদ এবং আশেপাশের অন্যান্য শহরগুলো থেকে দিরইয়্যাতে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। এছাড়াও তখন দিরইয়্যাহ একটি হিজরতের স্থান হয়ে দাঁড়ালো যেখানে মানুষ বিভিন্ন স্থান থেকে হিজরত করে আসছিল। দিরইয়্যাহ শহরে শাইখের খবর, পাঠদান, আল্লাহর প্রতি আহ্বান ইত্যাদি এক কান হতে অন্য কানে যাচ্ছিল। সুতরাং তারা দলে দলে ও ব্যক্তিগতভাবে শাইখের কাছে আসতেছিল। এতে শাইখ দিরইয়্যাতে সাহায্যপ্রাপ্ত, সম্মানিত, প্রিয়ভাজন ও শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। তিনি দিরইয়্যাতে আক্বীদা, কুরআন কারীম, তাফসীর, ফিক্বহ, হাদীস, মুস্তালাহুল হাদীস, আরবী ও ইতিহাসসহ অন্যান্য উপকারী ইলমের পাঠদান চালু করেন।

এরপর তার কাছে প্রতিটি স্থান থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল। তার কাছে দিরইয়্যাতে যুবক ও অন্যান্যরাও শিক্ষা লাভ করতে লাগল। তিনি

জনসাধারণ ও বিশেষ শ্রেণির মানুষের জন্য ব্যাপকভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা করলেন। দিরইয়্যাতে তিনি ইলমে দীন ছড়িয়ে দিলেন এবং দাওয়াতের উপরে অটল থাকলেন। এরপরে তিনি জিহাদ শুরু করলেন। মানুষকে এই ময়দানে যোগ দেওয়ার জন্য ও তাদের অঞ্চলে বিদ্যমান শিরকগুলোকে ধংস করার জন্য পত্রযোগে আহ্বান জানালেন। তিনি এটি শুরু করলেন নাজদের অধিবাসীদের মাধ্যমে, তিনি নাজদের আলিম সমাজ ও নেতৃস্থানীয়দের কাছে পত্র লিখলেন। রিয়াদের আলিমদের নিকটে লিখলেন, তখন সেখানকার আমীর ছিলেন দিহাম ইবনু দাওয়াস। তিনি খারজ শহরের আলিম ও নেতৃবৃন্দের কাছে পত্র লিখলেন। এছাড়াও দক্ষিণ অঞ্চলের শহরসমূহ এবং কসীম, হায়েল, আল-ওয়াশাম, সুদাইরসহ আরো অন্যান্য শহরেও তিনি পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এবং তাদের আলিম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকদের কাছে পত্র প্রেরণ অব্যাহত রাখলেন।

অনুরূপভাবে আহসা এবং হারামাইন শরীফাইনের আলেমগণের নিকট। পাশাপাশি এর বাইরের আলিমগণের নিকট, যেমন: মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ভারত, ইয়ামেন এবং অন্যান্য শহরের আলিমগণ। তিনি মানুষকে লিখতে থাকলেন এবং তাদের কাছে হুজ্জাত কায়েম করলেন। তিনি মানুষকে জানালেন যে সমস্ত ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ শিরক এবং বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, সেখানে কোন দীনের

সাহায্যকারী ছিল না; বরং সেখানে অনেক সাহায্যকারী ছিলেন। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা এই দীনের দায়িত্ব নিয়েছেন, অবশ্যই তার কোনো না কোনো সাহায্যকারী থাকবে। এই উম্মতের একটি দল সর্বদাই হকের ব্যাপারে সাহায্য প্রাপ্ত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রকমই বলেছেন। সুতরাং সেসব স্থানে সত্যের সহযোগিতা করার মত অনেকেই ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কিন্তু এখন যে বিষয়ে কথা হচ্ছে তা হচ্ছে নাজদ সম্পর্কে, সেখানে অকল্যাণ, বিশৃংখলা শিরক ও কুসংস্কার ইত্যাদি এমন ভাবে ছড়িয়ে ছিল, যার হিসাব একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। সেই সাথে সেখানে আলিমগণও ছিলেন যাদের মধ্যে উত্তম দিকগুলো থাকলেও তারা দাওয়াতের ময়দানে সেভাবে সক্রিয়ভাবে দাঁড়াতে সক্ষম হননি যেরকমটি প্রয়োজন ছিল।

ইয়ামেন এবং ইয়ামেনের বাইরে হকের দিকে দাওয়াত প্রদানকারী ও সহযোগী অনেকে ছিলেন, যারা এই শিরক এবং এই সকল কুসংস্কার সম্পর্কে জানতেন; কিন্তু আল্লাহ তাদের দাওয়াতকে সফলতার রূপ দান করেননি যেমনটি শাইখ মুহাম্মাদকে করেছিলেন। এর অনেকগুলো কারণ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে: তাদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগী ও সাহায্যকারী না থাকা, অধিকাংশ দা‘ঈদের সবর ও আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য না করা।

এর মধ্যে একটি কারণ হলো—কিছু দাঈ-এর জ্ঞানের স্বল্পতা, যার ফলে তারা মানুষকে যথাযথ পদ্ধতিতে, উপযুক্ত ভাষায়, হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিতে অক্ষম হন।

এছাড়াও আরও কিছু কারণ রয়েছে। এই বিপুলসংখ্যক পত্রালাপ, চিঠি এবং জিহাদের ফলেই শাইখের দাওয়াত প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর আহ্বান স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে ওঠে এবং তাঁর পাঠানো বার্তাগুলো আরব উপদ্বীপের ভেতরের ও বাইরের আলেমদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। শাইখের দাওয়াতে প্রভাবিত হয় অসংখ্য মানুষ—ভারত, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, আফ্রিকা, মরক্কো, মিসর, শাম এবং ইরাকসহ বহু দেশে। তৎকালে অনেক দাঈ ছিলেন, যারা সত্য সম্পর্কে জানতেন এবং মানুষের মাঝে সত্যের দাওয়াত দিতেন। যখন তারা শাইখের দাওয়াত সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তাদের কর্মচাঞ্চল্য ও শক্তি আরও বেড়ে গেল এবং তারাও দাওয়াতে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। শাইখের এই দাওয়াত ক্রমাগত প্রসারিত হতে থাকে এবং তা শুধু মুসলিম জাহানে নয়, অন্যান্য জাতি ও ভূখণ্ডেও ছড়িয়ে পড়ে। তারপর এই সাম্প্রতিক যুগে শাইখের গ্রন্থসমূহ, তাঁর চিঠিপত্র, তাঁর সন্তান-সন্ততি, অনুসারী ও সহকারীদের — যারা আরব উপদ্বীপের ভেতরে ও বাইরের প্রখ্যাত মুসলিম আলেম ছিলেন — তাঁদের রচনাও ছাপা হয়। এছাড়াও, শাইখের দাওয়াত, জীবনী ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থান বিষয়ে

রচিত গ্রন্থগুলিও ছাপানো হয়। ফলে, এই সব লেখা ও দাওয়াত অধিকাংশ অঞ্চল ও দেশে মানুষের মাঝে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। এটি স্বাভাবিক যে, প্রতিটি নিয়ামতের একটি হিংসুক থাকে এবং প্রতিটি দাঈ-এর বহু শত্রু থাকে — যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

“আর এভাবেই আমরা মানব ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অপরকে কুমন্ত্রণা দেয়। যদি আপনার রব ইচ্ছে করতেন তবে তারা এসব করত না; কাজেই আপনি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রটনাকে পরিত্যাগ করুন।” [আল-আন‘আম, আয়াত: ১১২]
যখন শাইখ দাওয়াতের মাধ্যমে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন, অনেক চিঠিপত্র লিখলেন, মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করলেন এবং তা মানুষের মধ্যে প্রচার করলেন, তখন বহু আলেম তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করলেন। এ অবস্থায়, একদল বড় সংখ্যক হিংসুক ও বিরোধী প্রকাশ্যে এল এবং আরও কিছু নতুন শত্রুও সামনে আসতে শুরু করল।

শাইখের শত্রু ও বিরোধীরা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল: একদল প্রকাশ্যেই তার বিরোধিতা করল ইলম ও দীন-

এর নামে। আর একদল ছিল, যারা রাজনৈতিক কারণে শাইখের বিরোধিতা করেছিল, তবে তারা তা প্রকাশ করেনি বরং নিজেদের ইলম ও দীনের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। তারা সুযোগ নেয় সেইসব আলেমদের শত্রুতার, যারা প্রকাশ্যে শাইখের বিরোধিতা করেছিল এবং বলেছিল—সে সঠিক পথে নেই এবং সে এমন-এমন (নিন্দনীয়) কাজ করে। কিন্তু শাইখ রাহিমাহুল্লাহ অবিচলভাবে দাওয়াত চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সন্দেহ ও ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করেন, প্রমাণ-দলীল স্পষ্ট করেন এবং কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী সত্যকে যেমন আছে তেমনিভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। কখনো তারা বলত—তিনি খারেজিদের (চরমপন্থীদের) একজন, আবার কখনো বলত—তিনি উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা) ভঙ্গ করেন এবং 'মুতলাক ইজতিহাদ' দাবি করেন এবং পূর্ববর্তী আলেম ও ফকীহদের কথা গ্রাহ্য করেন না। আবার কখনো অন্য নানা অভিযোগ করত। তাদের এসব আচরণ আসলে তাদের এক শ্রেণির জ্ঞানের অভাব থেকেই জন্ম নিয়েছিল। আরও একটি দল ছিল, যারা অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে এবং তাদের কথার ওপর নির্ভর করেছে। একটি দল ছিল যারা নিজেদের পদ-মর্যাদা ও অবস্থান হারানোর ভয়ে রাজনৈতিক কারণে শাইখের বিরোধিতা করেছে, যদিও তারা তা ইসলাম ও ধর্মের নামে গোপন রেখেছে। তারা

বিভ্রান্তিকর ও পথভ্রষ্ট লোকদের কথাকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে, শাইখের বিরোধীরা ছিল তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত:

প্রথম শ্রেণি — কিছু বিকৃত চিন্তার আলেম, যারা সত্যকে ভুল মনে করে আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বিশ্বাস করে, কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণ করা, সেখানে মসজিদ বানানো, কবরবাসীদের ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি সব কিছুই ধর্ম ও হেদায়েতের কাজ। তাদের ধারণা, কেউ যদি এসব কাজের বিরোধিতা করে, তাহলে সে নেককার বান্দাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছে এবং সে এমন একজন শত্রু যার বিরুদ্ধে জিহাদ করা আবশ্যক।

আরেকটি শ্রেণি হলো—জ্ঞানসম্পন্ন বলে দাবিদার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তির সত্য স্বরূপ বুঝতে অক্ষমরা। তারা তার আহ্বানকৃত সত্যকে জানে না, বরং অন্যদের অনুকরণ করে এবং ভুল পথে থাকা মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্তকারীদের কথাকে সত্য মনে করে। তারা ধারণা করে, তারা সঠিক পথেই আছে যখন তারা শাইখের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে সে আউলিয়া, নবী ও তাদের সম্মানকে ঘৃণা করে, তাদের বিরোধিতা করে এবং তাদের মর্যাদা অস্বীকার করে। এ কারণেই তারা শাইখকে নিন্দা করে, তার দাওয়াতকে তিরস্কার করে এবং তার থেকে দূরে সরে যায়।

আরেকটি শ্রেণি ছিল, যারা নিজেদের পদ ও মর্যাদাকে হারানোর ভয় পাচ্ছিল। তারা শাইখের বিরোধিতা করেছিল যাতে ইসলামী দাওয়াতের অনুসারীদের হাত তাদের উপর না পৌঁছায়, তাদের পদবি ও অবস্থান হারিয়ে না যায় এবং তাদের অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে না চলে যায়। শাইখ এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে কথাবার্তা এবং বিতর্ক চলতে থাকে। তারা একে অপরকে চিঠি লেখে, যুক্তি দেয় এবং পাল্টা যুক্তি দিয়ে প্রতিপাদন করে। একইভাবে, এই দ্বন্দ্ব শাইখের সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদের এবং দাওয়াতের শত্রুদের মধ্যে চলতে থাকে। ফলস্বরূপ, এ নিয়ে অসংখ্য চিঠিপত্র ও বিপুল পরিমাণ জবাব-পত্র তৈরি হয়। এই চিঠিপত্র, ফতোয়া ও জবাব-পত্রসমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে যা বেশ কয়েকটি খণ্ডে পরিণত হয়েছে, যার অধিকাংশই আল-হামদুলিল্লাহ ছাপা হয়েছে। শাইখ দাওয়াত ও জিহাদ অব্যাহত রেখেছেন। তাকে সহায়তা করেছেন দিরিয়্যার আমীর মুহাম্মদ ইবনে সউদ এবং সউদ পরিবারও এতে সম্পূর্ণভাবে এগিয়ে এসেছে। তারা জিহাদের পতাকা উত্তোলন করেছে এবং ১১৫৮ হিজরী সনে জিহাদের সূচনা হয়েছে। জিহাদ শুরু হয়েছে তলোয়ার এবং বচসার মাধ্যমে, যুক্তি ও প্রমাণসহ। এরপর তলোয়ারের সঙ্গে দাওয়াতও অব্যাহত থাকে। এটি জানা যায় যে, যিনি আল্লাহর পথে ডাকেন, তার যদি শক্তি না থাকে যা সৎকাজকে সমর্থন করে ও বাস্তবায়ন করে, তবে তার

দাওয়াত দ্রুত ম্লান হয়ে যাবে এবং তার খ্যাতিও নিভে যাবে, এরপর তার অনুসারীরাও কমে যাবে। তলোয়ারের প্রভাব দাওয়াতের প্রচারে, বিরোধীদের দমন ও সত্যকে জয়ী করায় অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত কুরআনে যা বলেছেন তা অবশ্যই সত্য এবং তিনি যা বলেন সবকিছুই সঠিক।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ "অবশ্যই আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়ের পাল্লা, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্টা করে। আমরা আরও নাযিল করেছি লোহা যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যেন চিনে নিতে পারেন যে, কে না প্রত্যক্ষ করেও তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" [আল-হাদীদ, আয়াত: ২৫] সুতরাং আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলদেরকে স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করেছেন। আর তা হচ্ছে হুজ্জাত এবং সুস্পষ্ট দালিলিক প্রমাণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা হককে স্পষ্ট করেছেন এবং বাতিলকে প্রতিহত করেছেন। তিনি রাসূলদের সাথে

কিতাব প্রেরণ করেছেন, যাতে রয়েছে স্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়াত এবং ব্যাখ্যা। তিনি তাদের সাথে মীযান নাযিল করেছেন। সেটি হচ্ছে ন্যায়বিচার যার মাধ্যমে মজলুম ও জালিমের মধ্যে ন্যায় ও নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর দ্বারা হক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর মাধ্যমে তিনি হিদায়াত ছড়িয়ে দেন। মানুষের সাথে তার আলোকে হকের ফয়সালা করেন। আর এ ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন লোহা, এতে রয়েছে অত্যন্ত শক্তি, রয়েছে ক্ষমতা, হুমকি ও ভয় প্রদর্শন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য, যারা হকের বিরোধিতা করে। সুতরাং লোহা হচ্ছে তাদের জন্য যার কাছে প্রমাণ কোন কাজে আসে না এবং তার মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলে না। আর এটি হচ্ছে তাদেরকে নিবৃতকারী।

এদের সম্পর্কে কতই না উত্তম কথা, যিনি বলেছেন:

وما هو إلا الوحي أو حد مرهف ***تزيل ظباه أخدعي كل مائل

আর তা তো অহী অথবা ধারালো তলোয়ার ছাড়া কিছুই নয় *** যার ধার প্রতিটি কুটিল ব্যক্তির ঘাড়ের সূক্ষ রগ দুটি ছিন্ন করে।

فهذا دواء الداء من كل جاهل ***وهذا دواء الداء من كل عادل

এটি (তলোয়ার) প্রতিটি জাহিলের রোগের ঔষধ *** আর এটি (অহী) প্রতিটি ন্যায়বান ব্যক্তির রোগের ঔষধ।

সুতরাং সুস্থ স্বভাবের অধিকারী বিবেকবান মানুষ দলিল দ্বারা উপকৃত হয় এবং দলিলের মাধ্যমে সে সত্যকে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তির অনুসারী জালিম ব্যক্তিকে তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছুই ভীত

করতে পারে না। তাই শাইখ রহমতুল্লাহি আলাইহি দাওয়াত এবং জিহাদ দুটির ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং আলে সা‘ঊদ বা সা‘ঊদ পরিবারের সহযোগীরাও তাকে সাহায্য করেছিলেন- আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তিনি জিহাদ এবং দাওয়াত ১১৫৮ হিজরী সাল থেকে অব্যাহত রাখলেন, যতদিন না আল্লাহ তার ওফাত দান করেন ১২০৬ হিজরীতে। সুতরাং জিহাদ এবং দাওয়াত প্রায় ৫০ বছরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। জিহাদ, দাওয়াত, সংগ্রাম, হকের ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ক এবং আল্লাহ ও তার রাসুল যা বলেছেন তার ব্যাখ্যা প্রদান, আল্লাহর দীনের দিকে মানুষকে আহ্বান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত প্রণয়ন করেছেন, তাতে উদ্‌বুদ্ধকরণ ইত্যাদি চলতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আনুগত্য মেনে নিল, আল্লাহর দীনে প্রবেশ করল, তাদের কাছে যে সকল গম্বুজগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস করল এবং তারা কবরের উপর নির্মিত তাদের মসজিদগুলোও ধ্বংস করল। তারা শরী‘আতকেই ফয়সালাকারী বানিয়ে নিল এবং তার আনুগত্য করল, তাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা যার উপরে ছিল, সেগুলো এবং তাদের নিয়ম-কানুনকেও ত্যাগ করল এবং তারা হকের দিকে ফিরে আসল, মসজিদসমূহ সালাত ও ইলমী হালাকাহর মাধ্যমে আবাদ করল, যাকাত আদায় করা হল এবং মানুষ রমযানে সিয়াম পালন করল, যেমনি আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলা

শরী‘আত প্রণয়ন করেছেন। সৎ কাজের আদেশ করা হল, অসৎ কাজে নিষেধ করা হল, রাস্তাঘাট, গ্রামগঞ্জ, শহরে ও বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা অর্জিত হল। মরুবাসীরা তাদের সীমার মধ্যে থেমে গেল, আল্লাহর দীনের মধ্যে প্রবেশ করল এবং হক গ্রহণ করল। শাইখ তাদের মধ্যে দাওয়াতের প্রসার ঘটালেন, তাদের কাছে সত্যের পথ নির্দেশক ব্যক্তিদেরকে প্রেরণ করলেন, দা‘ঈদেরকেও বিভিন্ন মরুবাসী ও বেদুঈনদের নিকটে পাঠালেন, যেমনিভাবে তিনি পথপ্রদর্শক, শিক্ষক ও কাযীদেরকে পাঠাতেন বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে-গঞ্জে। এই মহৎ কল্যাণ এবং হেদায়াত নাজদের প্রতিটি স্থানেই ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছিল এবং সেখানে সত্য ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আল্লাহ তা‘আলার দীন সেখানে প্রকাশিত হয়েছিল।

এরপর শাইখ রহমাতুল্লাহি আলাইহির মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা, পৌত্রগণ, সহযোগীবৃন্দ এবং ছাত্ররা আল্লাহর পথে দাওয়াতে এবং জিহাদে নিরবিচ্ছিন্নভাবে লেগে ছিলেন। শাইখের সন্তানদের মধ্য থেকে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন: আল-ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ হুসাইন ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ আলী ইবন মুহাম্মাদ, শাইখ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মাদ। আর তার পৌত্রদের মধ্য থেকে অগ্রগণ্য ছিলেন: শাইখ আব্দুর রহমান ইবন হাসান, শাইখ আলী ইবন হুসাইন, শাইখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ এবং আরো অনেকে। আর তাঁর ছাত্রদের মধ্যে

হতে ছিলেন: শাইখ হামদ ইবন নাসির ইবন মা‘মার, দিরইয়্যাহ শহরের অসংখ্য আলিম ও অন্যান্যরা। তারাও দাওয়াত ও জিহাদের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং তারা আল্লাহর দীনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা, পুস্তিকা লেখা এবং দীনের শত্রুদের সাথে জিহাদ করার মাধ্যমে। এই সমস্ত দা‘ঈদের মধ্যে এবং তাদের বিরোধীদের মধ্যে শত্রুতার কিছুই ছিল না, শুধুমাত্র এটা ছাড়া যে, তারা আল্লাহর তাওহীদ, আল্লাহর ইবাদাতের ক্ষেত্রে ইখলাছ ও এর উপরে দৃঢ় থাকা, কবরের উপর নির্মিত মসজিদসমূহ ও গম্বুজসমূহকে ধ্বংস করা ইত্যাদির প্রতি আহ্বান করতেন। এছাড়াও তারা সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, শরী‘আত প্রণীত হদ্দসমূহের কায়েম করা ইত্যাদির দিকেও আহ্বান করতেন। এগুলোই মূলতঃ মানুষের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে মত-দ্বন্দ্বের কারণ ছিল। সারকথা হচ্ছে: তারা আল্লাহর তাওহীদের দিকে মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, তার আদেশ করেছেন, মানুষকে আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং এর অসীলা ও উপকরণ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। মানুষকে ইসলামী শরীয়াত মেনে নেয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিলেন। আর যে ব্যক্তি স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং দাওয়াত এসে যাওয়ার পরেও এগুলো অস্বীকার করত এবং শিরকের উপরে অবিচল থাকত, তারা তার সাথে আল্লাহর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হতেন। তারা তার অঞ্চলে আগমন করতেন, যতক্ষণ না সে সত্যকে

মেনে নেয় এবং সত্যের অনুগত হয়। অথবা তারা তাকে বাধ্য করতেন শক্তি এবং তলোয়ারের মাধ্যমে, যতক্ষণ না সে এবং তার শহরের লোকেরা উক্ত বিষয় মেনে নেয়। অনুরূপভাবে তারা মানুষকে বিদ'আত এবং কুসংস্কার থেকে সতর্ক করতেন, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্ট প্রমাণ নাযিল করেননি, যেমন: কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ করা, তার উপর গম্বুজ প্রতিষ্ঠা করা, তাগুতদের কাছে ফয়সালার জন্য যাওয়া, গণক ও জাদুকরদের কাছে ভাগ্য জিজ্ঞাসা করা এবং সেগুলো বিশ্বাস করা ইত্যাদি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা শাইখ এবং তার সহযোগীদের মাধ্যমে এগুলো দূর করে দিয়েছেন—তাদের সবার উপর আল্লাহর রহমত—।

মসজিদসমূহ কিতাব এবং পবিত্র সুন্নাহ, ইসলামের ইতিহাস ও আরবী ভাষার উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দানের মাধ্যমে আবাদ করা হচ্ছিল। মানুষ ইলমী আলোচনা, ইলম অন্বেষণ, হেদায়াত, দাওয়াত ও পথ নির্দেশনা ইত্যাদির মধ্যে ব্যস্ত ছিল। অন্য আরেক শ্রেণির মানুষ ছিল যারা তাদের দুনিয়াবী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিল, যেমন: চাষাবাদ, শিল্প-কলকারখানা ইত্যাদি কাজে, তারাও ইলম, আমল, দাওয়াত, পথ নির্দেশনা, দীন ও দুনিয়ার কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এ ধরনের লোকেরা ইলম শিখত, আলোচনা করত, আবার সেই সাথে তারা চাষাবাদে, শিল্প কলকারখানাতে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে, ইত্যাদির কাজেও নিয়োজিত থাকত। তারা কখনো দীনের কাজে মশগুল হতেন, আবার কখনো দুনিয়ার

কাজে। এরা আল্লাহর দিকে পথ দেখাতেন এবং দা'ঈ হিসেবে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতেন, সেই সাথে তারা তাদের দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের শিল্প কর্মের সাথে জড়িত ছিলেন, যার ফলে তারা তাদের বাইরের দেশসমূহ হতে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। দা'ঈগণ এবং সা'উদ পরিবার নাজদে দাওয়াতী কাজ সম্পন্ন করার পরে, তাদের দাওয়াত হারামাইন এবং জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণ অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করলেন। তারা হারামাইনের আলিমদের কাছে আগে এবং পরে পত্র লিখলেন। কিন্তু যখন দাওয়াত ফলপ্রসূ হলো না এবং হারামাইনের অধিবাসীরা যার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যেমন গম্বুজকে সম্মান করা, কবরের উপর গম্বুজ স্থাপন করা এবং সেখানে শিরক এর উপস্থিতি এবং কবরের মানুষগুলোর কাছে সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি, তখন ইমাম সা'উদ ইবন আবদুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ শাইখের ওফাতের এগার বছর পরে হিজাযের দিকে রওনা হলেন। তিনি প্রথমে তায়েফের অধিবাসীদের অধীন করেন এবং তারপর তিনি মক্কার অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে রওনা হন। আহলে তায়েফের কাছে সা'উদের পূর্বে সেখানে গিয়েছিলেন আমীর উসমান ইবন আব্দুর রহমান অল-মুদ্বাইফী। সে তাদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে বশে আনেন, যেই শক্তি দিরইয়্যাহর আমীর সা'উদ ইবন আবদুল আজীজ ইবন মুহাম্মাদ নাজদ ও আশেপাশের এলাকার সৈন্য দিয়ে গঠন করে তার কাছে প্রেরণ করেছিলেন। এক বিরাট

শক্তিশালী বাহিনী। তারা আমীরকে সহযোগিতা করেন, ফলে তিনি শরীফ কর্তৃক নিয়োজিত আমীরদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করে তায়েফ দখল করে নেন এবং সেখানে আল্লাহর দিকে দাওয়াতকে প্রতিষ্ঠা করেন, হকের দিকে পথ নির্দেশ করেন, সেখানে যে সমস্ত শিরক বিদ্যমান ছিল এবং ইবন আব্বাসসহ অন্যান্যদের ইবাদাত যা তায়েফের অধিবাসীদের মধ্য হতে সেখানকার মূর্খ ও নির্বোধেরা করত, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেন। তারপর আমীর সা'উদ তার পিতা আবদুল আজীজ ইবনু মুহাম্মাদের আদেশে হিজায অভিমুখে রওনা হন এবং সৈন্যরা মক্কার চতুর্পাশে জড়ো হয়।

সুতরাং যখন মক্কার প্রধানরা বুঝতে পারল যে আত্মসমর্পণ অথবা পলায়ন ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা নেই তখন তারা জেদ্দার দিকে পলায়ন করল। সা'উদ এবং তার সাথে যে সকল মুসলিম ছিলেন তারা যুদ্ধ ব্যতিরেকেই সেখানে প্রবেশ করলেন এবং মক্কা দখল করলেন। এটি সংঘটিত হয়েছিল শনিবার ফজরের সময় ৮ মুহাররম ১২১৮ হিজরীতে। তারা সেখানে আল্লাহর দীনের দাওয়াতকে বিজয়ী করলেন এবং সেখানে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাসহ অন্যান্যদের কবরের উপরে স্থাপিত গম্বুজসমূহকে ধ্বংস করলেন। তারা প্রত্যেকটি গম্বুজের মূলোৎপাটন করলেন এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের প্রতি দাওয়াতকে বুলন্দ করলেন। সেখানে শিক্ষক, পথ-

নির্দেশক, আল্লাহর শরীয়তের মাধ্যমে ফয়সালাকারী কাযীদেরকে নিয়োজিত করলেন। এরপর খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে মদীনা বিজয় হয়। সা'উদ পরিবার মক্কা বিজয়ের মাত্র দু'বছর পরেই ১২২০ হিজরীতে মদীনা দখল করেন। এরপর থেকে হারামাইন সা'উদ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। তারা সেখানে নিয়োগ করেছিলেন পথ নির্দেশক এবং দা'ঈ। তারা দেশে ন্যায়বিচার ও শরীয়তের হুকুম জারী করেছিলেন এবং নাগরিকদের প্রতি ইহসান করেছিলেন বিশেষতঃ হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং অভাবী মানুষদের প্রতি। তারা তাদেরকে সম্পদ দিয়ে ইহসান করেছেন। তাদের প্রতি সহমর্মী হয়েছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন, তাদেরকে কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, আলেমদেরকে সম্মান করেছেন এবং তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন দীনী শিক্ষা ও পথনির্দেশনার ক্ষেত্রে। এভাবে করে ১২২৬ হিজরী সাল পর্যন্ত হারামাইন শরীফাইন সা'উদ পরিবারের রক্ষনাবেক্ষনে ছিল। তারপর মিশরীয় ও তুর্কি সেনাবাহিনী হিজাজের দিকে রওনা দিতে শুরু করল—আল সউদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দ্বীনের দুই পবিত্র স্থান থেকে তাদের উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে। এর পেছনে বহু কারণ ছিল, যেগুলোর মধ্যে কিছু আগেই উল্লিখিত হয়েছে। এই যুদ্ধের পেছনের কারণগুলো, যেমন আগেই বলা হয়েছে, হলো—শাইখ ও তাঁর অনুসারীদের শত্রুরা, হিংসুকরা, বিভ্রান্ত বিশ্বাসে চলা কিছু লোক যাদের

কোনো অন্তর্দৃষ্টি নেই এবং কিছু রাজনীতিক যারা এই দাওয়াতকে দমন করতে চেয়েছিল, এই ভয়ে যে তা তাদের ক্ষমতা হরণ করবে এবং তাদের লালসা ও স্বার্থ শেষ করে দেবে। তারা শাইখ, তাঁর অনুসারী ও সহযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটিয়েছিল। তারা বলেছিল: শাইখ ও তাঁর অনুসারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ঘৃণা করে, তাঁরা আউলিয়া ও পীরদের ভালোবাসে না, তাঁদের কারামাত অস্বীকার করে। তারা আরও বলেছিল, শাইখ ও তাঁর অনুসারীরা এমন-এমন কথা বলেন, যার মাধ্যমে — তাদের দাবি অনুযায়ী — তারা নাকি নবী-রাসূলদের মর্যাদা হানি করেন এবং তাদের অসম্মান করেন। এইসব অপবাদে কিছু অজ্ঞ লোক বিশ্বাস করে বসে, আর কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তি এইসব অপবাদকে হাতিয়ার বানিয়ে শাইখদের ওপর আক্রমণ চালানোর ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার উপলক্ষ বানিয়ে ফেলে। এর মাধ্যমে তারা তুর্কি ও মিশরীয়দের উসকে দেয় শাইখ ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। এর ফলে বহু ফিতনা ও যুদ্ধ শুরু হয় এবং মিশরীয় ও তুর্কি সৈন্যদের এবং নাজদ ও হিজাজে আল সৌদদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ চলতে থাকে দীর্ঘ সাত বছর, ১২২৬ হিজরী থেকে ১২৩৩ হিজরী পর্যন্ত — যা ছিল সত্য ও মিথ্যার শক্তির মধ্যে এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াই।

সারকথা এই যে — শাইখ মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওহাব (রেহিমাহুল্লাহ) এমন একজন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর

দ্বীনকে প্রকাশ করার জন্যই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেন এবং তাদের মধ্যে যে বিদআত ও কুসংস্কার প্রবেশ করেছিল, তা থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

তিনি আরও চেষ্টা করেছিলেন মানুষকে সত্যের প্রতি বাধ্য করতে, মিথ্যা থেকে বিরত রাখতে, সৎ কাজের আদেশ দিতে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতে।

এটাই ছিল শাইখ রাহিমাহুল্লাহুর দাওয়াতের সারকথা।

বিশ্বাস-আকীদার দিক থেকে তিনি ছিলেন সালাফে সালেহীনের পথের অনুসারী। তিনি আল্লাহ, আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীতে ঈমান রাখতেন; ঈমান রাখতেন আল্লাহর ফেরেশতা, রাসূল, কিতাব, আখেরাতের দিন এবং তাকদিরে—এর ভালো-মন্দ সব কিছুতেই। তিনি ইসলামের ইমামদের মত অনুযায়ী তাওহীদে বিশ্বাস করতেন, একমাত্র আল্লাহর জন্যই ইবাদত একনিষ্ঠভাবে সম্পাদনের আহ্বান জানাতেন। তিনি আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে এমনভাবে বিশ্বাস করতেন যা আল্লাহর মহিমার সাথে মানানসই—তিনি আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকার করতেন না, আবার আল্লাহকে সৃষ্টির সাথে তুলনাও করতেন না। তিনি পুনরুত্থান, হাশর-নশর, বিচার, হিসাব, জান্নাত-জাহান্নাম এবং অন্যান্য ঈমানের বিষয়ে বিশ্বাস করতেন। ঈমান সম্পর্কে তিনি সালাফদের কথাই

বলতেন—ঈমান হলো কথা ও কাজ উভয়ের সমষ্টি, যা আনুগত্যে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহে কমে যায়। এগুলো ছিল শাইখ রাহিমাহুল্লাহুর আকীদা। সুতরাং তিনি সালাফের পথ ও আকীদার উপরেই ছিলেন, কথা ও কাজে, তিনি কখনোই তাদের পথ হতে বাইরে যাননি। আর না তার আকীদার ক্ষেত্রে কোনো আলাদা মাযহাব ছিল, না কোনো পথ-পন্থা ছিল। বরং তিনি সাহাবী ও ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণকারী তাবি‘ঈগণ তথা সালাফে সালিহীনের পথেই ছিলেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর রাযী-খুশী হয়েছেন।

তিনি নাজদ ও তার আশেপাশের এলাকাগুলোতে এটাই প্রচার করেছিলেন এবং এর দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন। তারপর তিনি যারা অস্বীকার করেছিল এবং এগুলোকে বিদ্বেষমূলকভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিল, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও লড়াই করেছিলেন, যতক্ষণ না আল্লাহর দীন বিজয়ী হয় এবং সত্যের জয় হয়। অনুরূপভাবে তিনি ছিলেন সেই পথের উপরে, যে পথে মুসলিমরা আল্লাহর পথে দাওয়াত দিয়েছিলেন, বাতিলের বিরোধিতা করেছিলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেছিলেন। উপরন্তু শাইখ এবং তার সহযোগীরা মানুষকে হকের দিকে ডাকতেন, তাদেরকে এটা মেনে নিতে বাধ্য করতেন, তাদেরকে বাতিল থেকে নিষেধ করতেন এবং তাদেরকে বাতিলের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করতেন। তাদেরকে এসব করতে নিষেধ করতেন, যতক্ষণ না তারা সেটাকে পরিত্যাগ

করে। অনুরূপভাবে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বিদ'আত এবং কুসংস্কারকে রুখে দেয়ার ক্ষেত্রে, যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার দাওয়াতের মাধ্যমে সেগুলোকে পরিপূর্ণভাবে দূর করে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনটি কারণ, যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হল, এগুলোই হচ্ছে তার মধ্যে ও মানুষের মধ্যে শত্রুতার কারণ। তা হচ্ছে:

প্রথমতঃ শিরকী কাজে বাঁধা প্রদান করা এবং মানুষকে খালেস তাওহীদের দিকে আহ্বান করা।

দ্বিতীয়তঃ কুসংস্কার ও বিদ'আতকে নিষিদ্ধকরণ, যেমন: কবরের উপরে স্থাপনা নির্মাণ করা, কবরসমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করা ও জন্ম দিবস পালন করা, যে সমস্ত বিষয় সুফিদের মধ্য থেকে একটি দল আবিষ্কার করেছিল।

তৃতীয়তঃ তিনি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং তাদেরকে সৎ কাজ করতে শক্তি প্রয়োগে বাধ্য করতেন। সুতরাং যে সৎকাজকে অস্বীকার করত যা আল্লাহ তার উপরে ওয়াজিব করেছিলেন, তাকে তিনি বাধ্য করতেন শক্তি দ্বারা এবং তিরষ্কার করতেন যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে। তিনি মানুষকে অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন, তাদেরকে অসৎকাজ হতে বাধা প্রদান করতেন এবং হদসমূহ কায়েম করতেন, মানুষকে হকের ক্ষেত্রে বাধ্য করতেন, তাদেরকে বাতিল থেকে বাধা প্রদান করতেন এবং এর মাধ্যমেই হকের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তা ছড়িয়ে পড়েছিল, বাতিল ধ্বংস

এবং বিনষ্ট হয়েছিল। আর মানুষ তখন উত্তম পথেই অবস্থান করতে থাকল এবং তারা তখন অবিচল মানহাজের উপর অবস্থান করতে থাকল তাদের বাজারসমূহে, মসজিদসমূহে এবং অন্যান্য সকল অবস্থান ও অবস্থাতে।

তাদের মধ্যে কোন রকম বিদ‘আত দেখতে পাওয়া যেত না, তাদের দেশে কোনো ধরনের শিরক বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের মধ্য থেকে কোনোরূপ অন্যায়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটত না। বরং যে ব্যক্তি তাদের অঞ্চল দেখেছিল, তাদের অবস্থা দেখেছিল এবং যে অবস্থার উপরে তারা ছিল তা প্রত্যক্ষ করেছিল, সে সালাফে সালেহীনের অবস্থার কথা স্মরণ করতে পারত এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যার উপরে ছিল এবং তার সাহাবীদের যুগে এবং ইহসানের সাথে তাদের অনুসারী তাবেয়ীদের যুগে, তথা তিনটি শ্রেষ্ঠ যুগে সালাফগণ যার উপর ছিল তা স্মরণ করতে পারত। আল্লাহ তাদের উপর রহমত করুন। সুতরাং মানুষেরা তাদের জীবন চরিতের উপরেই ছিল, তাদের মানহাজকে গ্রহণ করেছিল, এটার উপরে ধৈর্য ধারণ করেছিল, তার মধ্যেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল এবং সে পথেই যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যখন কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয় শেষের দিকে এসে শাইখ মুহাম্মাদ মারা যাওয়ার বেশ কিছু সময় পরে এবং তার অধিকাংশ সন্তান ও সহযোগীদের মৃত্যুর পরে, আল্লাহ তাদেরকে রহমত করুন, তখন পরীক্ষা এবং দুর্দশা নেমে আসে

তুর্কি মিশরীয়দের মাধ্যমে। এ কথার সত্যতা প্রদানকারী আল্লাহর বাণী:

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ "আল্লাহ কোনো কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের পরিবর্তন ঘটায়।" [আর-রা'দ, আয়াত: ১১] আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি তাদের উপরে যে বিপদ এসেছিল তা যেন তাদের গুনাহের কাফফারা বানিয়ে দেন। তাদের মর্যাদা এবং শাহাদত নসিব করেন যারা তাদের মধ্যে নিহত হয়েছিল, আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন এবং সন্তুষ্ট হোন। তাদের এ দাওয়াত -আলহামদুলিল্লাহ- প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসারিত আমাদের আজকের এই দিন পর্যন্ত। মিশরীয়রা নাজদে যে গোলযোগ সৃষ্টি করার করেছিল, তারা সেখানে যাদেরকে হত্যা করার হত্যা করেছিল এবং যা ধ্বংস করার তা ধ্বংস করেছিল। তবে তা মাত্র কয়েকটি বছর স্থায়িত্ব পেয়েছিল। এরপরে পুনরায় দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঁচ বছর পরেই উক্ত দাওয়াত নিয়ে উত্থান ঘটে ইমাম তুর্কি ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ রাহিমাহুল্লাহুর। সুতরাং তিনি সেখানে এবং তার আশেপাশের অঞ্চলে দাওয়াত ছড়িয়ে দেন এবং আলিমগণ নাজদে ছড়িয়ে পড়েন। তিনি সেখান থেকে যে সমস্ত তুর্কি এবং মিশরীয়রা ছিল, তাদেরকে বের করে দেন। তাদেরকে তিনি নাজদ, তার আশেপাশের গ্রামগুলো এবং

শহরগুলো হতেও বিতাড়িত করেন। এরপরে ১২৪০ হিজরী সালে নাজদে দাওয়াত প্রসারিত হয়।

দিরইয়্যাহ শহরের ধ্বংস ও আলে সা'উদ এর রাজত্ব বিনষ্ট হয়ে পড়ে ১২৩৩ হিজরীতে। সুতরাং তখন মানুষ নাজদে এক বিশৃংখলা, ফিতনা ও লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে যায়। যার ব্যাপ্তি ১২৩৪ হিজরী থেকে ১২৩৯ হিজরী পাঁচ বছর পর্যন্ত ছিল। এরপরে ১২৪০ হিজরীতে মুসলিমদের একটি দল নাজদে জমা হয় ইমাম তুর্কি ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ এর নেতৃত্বে। সেখানে হক প্রতিষ্ঠিত হয়, আলেমগণ বিভিন্ন গ্রাম ও শহরের উদ্দেশ্যে নানা চিঠিপত্র লেখেন এবং তারা মানুষকে উৎসাহী করে তোলেন। তাদেরকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানান। তখন ফিতনা নির্বাপিত হয়, যা তাদের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে এসেছিল, যার পিছনে ছিল মিশরীয় সেনাবাহিনী এবং তাদের সহচরদের হাত। এভাবেই যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ফিতনা নিঃশেষ হয়ে যায়, যা ঐ যুদ্ধসমূহের পিছু নিয়ে এসেছিল এবং তার অগ্নি নির্বাপিত হয়। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মানুষ এরপরে পুনরায় তা'লিম, পথনির্দেশনা, দাওয়াত এবং আল্লাহমুখী করণের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি পানি তার আপন প্রবাহে ফিরে আসে, মানুষও তাদের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে, যে অবস্থায় তারা শাইখের জামানায়, তার ছাত্রবৃন্দ, সন্তান-সন্ততি এবং তার সহযোগীদের জামানায় ছিল। আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন এবং রহমত বর্ষণ করুন! এই দাওয়াত

অব্যাহত রয়েছে ১২৪০ হিজরী সাল থেকে আমাদের আজকের দিন পর্যন্ত, আলহামদুলিল্লাহ। সা'উদ পরিবার, শাইখের পরিবার এবং নাজদের আলিমগণও একে অপরকে প্রতিনিধিরূপে রেখে যাচ্ছেন। অদ্যাবধি সা'উদ পরিবার একে অপরকে রাজত্ব, আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং আল্লাহর পথে জিহাদের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে চলেছেন।

এভাবে আলিমগণ তারা একে অপরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত এবং তার দিকে পথনির্দেশের ক্ষেত্রে, মানুষকে হকমুখী করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যাচ্ছেন। তবে হারামাইন শরীফাইন সৌদি রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে বেশ কিছুদিন বিচ্ছিন্ন ছিল। এরপরে এ দু'টি ১৩৪৩ হিজরীতে তাদের নেতৃত্বে আসে এবং ইমাম আবদুল আজিজ ইবন আব্দুর রহমান ইবন ফয়সাল ইবন তুর্কি ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সা'উদ রাহিমাহুল্লাহু হারামাইন নিজ দখলে নিয়ে নেন। আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে আজ পর্যন্ত এ দুটি স্থান এই রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন রয়েছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আলে-সউদ বংশের যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন, আল শাইখ বংশের সদস্যরা এবং এই দেশসহ বিশ্বের সব মুসলিম আলেমদেরকে হিদায়াত দান করেন, তাঁদেরকে তার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করেন। তিনি যেন বিশ্বের যেখানেই মুসলিম আলেমরা থাকুন না কেন, তাঁদেরকে সংশোধন করেন,

তাঁদের মাধ্যমে সত্যকে বিজয়ী করেন এবং মিথ্যাকে পরাজিত করেন। তিনি যেন হিদায়াতের আহ্বানকারীদের, তারা যেখানেই থাকুন, সেই দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেন যা আল্লাহ তাঁদের ওপর ফরজ করেছেন। তিনি যেন আমাদের ও তাঁদের সবাইকে সঠিক পথের হিদায়াত দেন, পবিত্র দুই হারাম (মক্কা ও মদিনা) ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো এবং সমগ্র মুসলিম ভূখণ্ডকে হিদায়াত ও সত্য ধর্ম দ্বারা পূর্ণ করে দেন। তিনি যেন কোরআন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর মহত্ব ও মর্যাদা আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, আমাদের সবাইকে এর গভীর জ্ঞান দান করেন, দৃঢ়তার সঙ্গে এদের অনুসরণ করার তাওফিক দেন, তাতে ধৈর্য ধরার ও অবিচল থাকার শক্তি দেন এবং সেগুলোর ভিত্তিতে বিচার-ফয়সালা করার তাওফিক দেন—এমনকি আমরা যেন তাতে অবিচল থেকে আমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করি। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান এবং দোয়া কবুল করার সর্বাধিক উপযুক্ত। এটাই ছিল শাইখের অবস্থা, তাঁর দাওয়াত, তাঁর অনুসারী ও বিরোধীদের সম্পর্কে আলোচনার শেষাংশ—যতটুকু সহজভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। সবকিছুর জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য কাম্য, তাঁরই ওপর ভরসা করা উচিত। আর শক্তি ও ক্ষমতা একমাত্র মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর শান্তি, রহমত ও বরকত নাজিল করুন—তাঁর পরিবার, সাহাবাগণ এবং যাঁরা তাঁর পথ অনুসরণ করেন ও তাঁর হিদায়াতের আলো ধরে রাখেন, সবার ওপর। আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

সূচিপত্র

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাব: দাওয়াত ও জীবনচরিত ...2

bn166v1.0 - 03/09/2026